বিজনদা অসম্ভব ব্যতিক্রমী নাট্যব্যক্তিত্ব

শ্যামল ঘোষ রায়

আমি বিজনদার সঙ্গে যুক্ত হই ১৯৬২ সালের মধ্যভাগে। সেইসময় আমার এক বন্ধু দুলাল মান্না যে একজন Bus Conductor ছিলেন, এবং নাটককে এতো বেশি ভালোবাসতেন যে, সন্ধ্যা বেলায় রিহার্সাল করার জন্য সারা জীবন Morning duty নিয়েছিলেন। তারই হাত ধরে আমি সেই সময় বিজনদার কাছে যাই। তখন আমার বয়স ১৯-২০ হবে। আমি শ্মশান পাড়ার ছেলে। আমি ছোটো বয়সেই পাড়ায় কিছু নাটক করেছিলাম। আমার বড়ো দাদা ছিলেন একজন অভিনেতা। সেখান থেকেই আমার উৎসাহটা হয়। এবং সেই সূত্রে পাড়াতে দুই একটি নাটক করে কিছু সুনাম পাই। আমি সেই সময়ে তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' নাটকে নুটু বিহারির চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। ফলে আমার মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছিল যে আমি ভালো অভিনয় করতে পারি। সেই কারণেই দুলাল মান্নার সঙ্গে আমি টাউনসেন্ড রোডের যে বাড়িতে বিজনদা তখন 'ক্যালকাটা থিয়েটার - এর' রিহার্সাল করাতেন সেখানে যাই। সেই রিহার্সাল রুমের তখন ভাড়া ছিল ২ টাকা ৫০ পয়সা প্রত্যহ। ২ টাকা ২৫ পয়সা ঘর ভাড়া আর ২৫ পয়সা হারমোনিয়াম ভাড়া। সেই টাকাটা গৃহ মালিককে হাতে আগে দিয়ে তারপর ঘরে ঢুকতে হত।

বিজনদার কাছে আমি যে দিন প্রথম গেলাম, ঠিক তার আগে দিন মুক্তাঙ্গনে 'ছায়াপথ' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই পরের দিন একটা আলোচনা হয়। আগের দিনে শোয়ের বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য একটা আগ্রহ থাকে। কিন্তু সেই দিন ওখানে গিয়ে মাত্র তিন জন মানুষকে উপস্থিত দেখেছিলাম। সেখানে কিছু সময় কথা বলার পর বিজনদা আসেন রাত ৮টার সময়। সেই সময় বিজনদা 'সুবর্ণ রেখা'র শুটিং করছিলেন। একটা কথা বলে রাখা ভালো যে, সেদিন আমি প্রথম ক্যালকাটা থিয়েটারে যাই সেই দিন আমি স্বীকার করে নিচ্ছি আমার অজ্ঞতা, মূর্খতী নিয়ে যাই। বিজন ভট্টাচার্য সম্পর্কে আমার দিন আমি স্বীকার করে নিচ্ছি আমার অজ্ঞতা, মুর্খতা নিয়ে যাই। বিজন ভট্টাচার্য সম্পর্কে আমার কোনো ধ্যান ধারণাই ছিল না। বিজন ভট্টাচার্য নট, নাট্যকার, লেখক সে কতো বড় মাপের সে সম্পর্কে কোনো ধ্যান ধারণাই আমার ছিল না। যাইহোক সেইদিন রিহার্সাল রুমের উপস্থিতির ঐ হার দেখে উনি প্রকাশ না করলেও আমার যতদূর মনে হয়েছে উনি ভিষণ ক্ষিপ্ত ছিলেন। তিনি রিহার্সাল রুমে ঢোকেননি। গেটে দাঁড়িয়েই কথা বলছিলেন। আমার মতো একজন নতুন মুখকে দেখে বোধ হয় ওনার সেই রাগ, উনি প্রকাশ করার জন্য ভেতরে ঢোকেন নি। আমার সন্ধান উনি অন্যদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এ কে? তখন আমি আমার পরিচয় দিলাম। উনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, কি করতে এসেছ? আমি বললাম আপনাদের এখানে নাটক হয়। আমার নাটক ভালো লাগে তাই এসেছি। উনি বললেন, কতদূর পড়াশোনা করেছ? আমি বললাম, খুব নগণ্য, সবে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছি। তখন উনি আমায় বললেন, নাটক করে কি হবে? আমি বললাম সেই উত্তর আমি দিতে পারব না, আমার ভালো লাগে তাই এসেছি। উনি বললেন, আলু - পটল বেচনা, তাতে তো দুটো পয়সা হবে। নাটক করে কি হবে। তখনই বুঝতে পারলাম সেই দিনের উপস্থিতির হার ওনাকে ভেতরে কতটা ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। তারপর কয়েকটি কথাবার্তা বলার পর উনি চলে যান। আমায় বলে যান —বেশি যদি ভালো লাগে তাহলে এসো, না হলে আলু - পটল বিক্রি করো দুটো পয়সা রাজগার হবে। তা আমার সেই দিন কথাগুলি খুব একটা ভালো লাগেনি। যাইহোক পরের দিনও এলাম। তখন ৬ দিন রিহার্সাল ছিল। একমাস বাদেই 'মরাচাঁদের' ডেট দিল মুক্তাঙ্গন। আমাকে একটা চরিত্র দেওয়া হলো, এই নাটকের জন্য। একটা ছোট্ট চরিত্র, শো -এর ডেট প্রায় চলে এলো, তখন শেষের দিকে আর একটি চরিত্রের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। সেই সময় আমি টের পেলাম ওনার দেখানোর পদ্ধতি, যদিও সেটা সামান্য। কারণ শেষের দিকে যে চরিত্রটা দেওয়া হলো সেটা ছোট্ট এবং শেষ দৃশ্যে। সেই দৃশ্যে আমি কয়েকজনকে সরিয়ে বিজনদার কাছেই যাব। অর্থাৎ মরাচাঁদে যখন চরিত্র করছেন উনি সেইখানে যাব। তা আমি সেই ভিড় সরাতে গিয়ে আমার দুটি হাত কাজ করছিল না। আমার দুদিকেরই লোককে আমার সরানোর কথা ছিল। কিন্তু আমার বাম হাত কাজ করছিল ডান হাত কাজ করছিল না। উনি দেখে বললেন, তোমার ডান হাত না থাকত তা হলে বিশ্বাসযোগ্য হত, যে তুমি একহাতেই সরাবে। তারপর আমার আর ভুল হয়নি। ফাইনালি যখন মুক্তাঙ্গনে নাটক মঞ্চস্থ হবে তার আগে থেকেই আমার হাত পা কাঁপছিল। কারণ ঐ এক মাসের মধ্যে আমি বিজনদা সম্পর্কে কিছু কিছু জেনেছি। প্রথম যে চরিত্রটা নির্দিষ্ট ছিল সেটা আমি উতরে গেলাম। এই নাটকে উনি দুটি চরিত্র করছিলেন। একটি অন্ধ বাউল আর একটি কীর্ত্তনীয়া। এই নাটক চলাকালীন একটি দৃশ্য ছিল, যেখানে রাধা তাকে ছেড়ে চলে যায়। সেই সময় উনি তুলসীমঞ্চের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তিনি সেই ফুটোটা খুলে দেন। সেই কলসী থেকে কলের মতো জল পড়তে থাকে। আর সেই জলটা তিনি এমনভাবে মুখে ধারন করেছেন যে কণ্ঠটা নামছে উঠছে। মানে তার বিভ্রান্তি, তার যন্ত্রণা স্ত্রী চলে যাবার, যেটা আমি —পাশ থেকে অবাক বিস্ময়ে দেখলাম। যেটা আমি রিহার্সালে কোনো দিন দেখিনি। কারণ ওটা রিহার্সাল করে যায় না। তারপর নাটক শেষ হল। সেই অবস্থা নিয়ে বাড়িতে এলাম, সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। কারণ সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, যে আমি কালকে ওখানে যাব কিনা। কারণ বিজনদার ঐ পারফরমেন্স দেখে আমার মনে হয়েছিল যে আমি বোধহয় ওখানে কিছু করতে পারব না। তবুও আমি পরের দিন রিহার্সালে গেলাম। তারপর থেকে ১২ বছর বিজনদার সাথে ছিলাম।

বিজনদার সাথে থাকাকালীন দেখেছি অনেক মানুষ এসেছেন, অনেকে চলেও গেছেন। যে রকম আমার একজনের কথা মনে পড়ে জ্যোতি মিত্র বলে এক ভদ্রলোক, তিনি 'মরাচাঁদ' -এ ভোলার চরিত্র করতেন। ঋত্বিক ঘটক এসেছ মুক্তাঙ্গনে 'দেবীগর্জন' দেখতে। ঋত্বিক বাবু 'মরাচাঁদের' সেটের ব্যাপারে বিজনদাকে অনেক সাহায্য করে ছিলেন। সজল রায় চৌধুরী, রেবা রায়চৌধুরি আসেন ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে 'মরাচাঁদ' করার পরের মাসেই 'ছায়াপথ' নাটকের ডেট দিল মুক্তাঙ্গন। কিন্তু unfortunately সে শো করা হয়নি। কারণ সেই সময় চীনের আগ্রাসন শুরু হয়ে গেছে। এবং সেই আগ্রাসনটা বিজনদার একটি ক্রান্তিকাল ছিল। কারণ সেই সময়ই দেখেছি যে, কমিউনিস্ট পার্টির এই চিনের আক্রমণ নিয়ে যে মতভেদ যার দরুন ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টিকে ভাগ হতে হল। সেই সময় আনন্দ বাজার এবং অন্যান্য পত্রিকা ভীষণভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্কে লেখালেখি শুরু করাতে বিজনদার অনেক কাছের মানুষকে বিজনদাকে পরিত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছে।

সেই সময় একজন ভদ্রলোক ছিলেন ধীরেন দাস। উনি সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। উনি ঠিক নাটকের আমি বলব না। কিন্তু বিজনদার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক বা পরিচিতি। কারণ বিজনদার পদ্মপুকুরের বাড়ির কাছেই ধীরেনদা থাকতেন। সেই সূত্রে ধীরেনদা বিজনদার সাথে ভীষণভাবে জড়িয়ে যান, I.P.T.A. থাকার সময় থেকেই। এবং যতদিন বিজনদা কাজ করেছেন ধীরেনদাও ওনার সাথে ছিলেন। শুধু রিহার্সালের নয় ধীরেনদা ও আমরা বিজনদার বাড়িতেও বহু সময় কাটাতাম। ধীরেনদা বিজনদার মোটমুটি সব নাটকেই সঙ্গীতের দিকটা দেখতেন। যেমন —মরাচাঁদ, দেবীগর্জন, জীয়নকন্যা ইত্যাদি। জীয়নকন্যা আমি থাকাকালীন মঞ্চস্থ হয়নি। জীয়নকন্যা মঞ্চস্থ হয়েছিল একবারই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে রংমহলে। পরে একটা রেডিও প্রোগ্রামও হয়েছিল। কিন্তু তাপসদা ও শমিক ব্যানার্জীর উদ্যোগে জীয়নকন্যা আবার মঞ্চস্থ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। সেই প্রচেষ্টাও নঞ্চ অবধি যেতে পারেনি। সেই সময় মহিলা শিল্পী ছিলেন তাপস সেনের স্ত্রী গীতা সেন, উমা বসু, অঞ্জলি ভট্টাচার্য প্রমুখ। ধীরেনদা খুব খেটেছেন।

বিজনদার শিক্ষণ পদ্ধতি বলতে, উনি যেটা বহু আলোচনার মধ্য দিয়ে বলেছেন, যে তিনি নাটক লেখা বা করার জন্য আসেননি। উনি কমিউনিস্ট পার্টিতে থাকার মধ্য দিয়েই নাটকে এসেছেন। নাটক লিখবেন, নাটক করবেন এই রকম স্বপ্ন তাঁর ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টিতে এসে উনি ফর্ম খুঁজছিলেন, কিভাবে কি করবেন? মানুষের এই দুঃখ যন্ত্রণা মানুষের কাছে কীভাবে তুলে ধরবেন? তিনি যখন প্রথম আগুন নাটক লিখলেন, পরবর্তী সময়ে জবানবন্দী, অবরোধ, কলঙ্ক, মরাচাঁদ এই সব নাটক লিখে উনি নট - নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর উনি বলেছিলেন যে, গ্রামার পড়ে নাটক লেখার কল্পনা কোনো দিন তিনি করেন নি। তিনি বলতেন, আমার দায় ছিল message টা পৌঁছে দেবার। সেই message পৌঁছে দেবার দায় থেকেই আমার নাটক লেখা।

বিজনদার নির্দেশনার কোনো বাঁধা ধরা ছক ছিল না। ওনার বেশিরভাগ নাটক ছিল কৃষিজীবি ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের উপর।প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে তিনি সব সময় বলতেন যে, তোমার চারপাশেই এই সকল চরিত্রগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের দেখে শেখো। যেমন 'ছায়াপথ' নাটক করতে গিয়ে (ভিখারিদের নাটক) উনি কিছু ছেলেকে কালিঘাটের কালি মন্দিরের কাছে বসতে বলেছিলেন। উনি বলে ছিলেন, ওখানে গিয়ে দেখ বিভিন্ন জাতের ভিখারিরা কেমন করে সেখানে সারাদিন ভিক্ষাবৃত্তি করে, তাদের চলন বলন লক্ষ্য কর। সম্ভব যদি হয় যেতে যেতে দুই একজনের সাথে একটু মেশারও চেষ্টা কর, কথা বলার চেষ্টা কর। দলের মধ্যে ৪-৫ জন গিয়েও ছিল। সবাই থাকতে পারেনি চলে এসেছে। যে কয়জন ছিল তারাই জিতেছে। সুতরাং শিক্ষার ব্যাপারটা তিনি যে যার বোধের উপর ছেড়ে দিতেন। তিনি বলতেন, তুমি তোমার বোধকে কাজে লাগাও। অনেকেই বলতেন যে বিজনদা হাতে ধরে কিছু শেখান না। তিনি বলতেন এটা Institution নয়, রিহার্সাল attend কর। রিহার্সাল attend করতে করতেই অনেক কিছু শিখে যাবে। যেরকম আমি কিছু কিছু নাটকে বিরল মুহূর্ত দেখেছি। সেগুলো আমার অভিনয় জীবনে পরে ভীষণ কাজে লেগেছে।

'আজ বসন্ত' নামে একটি নাটক সেই সময় করার চেষ্টা হয়েছিল। তখন ৬৬-৬৭ খ্রিস্টাব্দ। তখন মমতা কর বলে একজন অভিনেত্রী ছিলেন। তিনি বৃষ্টির মধ্যে জল ভেঙ্গে ভেঙ্গে এসেছেন রিহার্সাল করতে, বিজনদার বাড়িতে। জামা কাপড় সব ভিজে গেছে। বিজনদার বাড়িতে তখন বিজনদা, বিভূতিদা, আমি উপস্থিত। মমতা কর আসতে বিজনদা বলল, তুমি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এলে কেন? মমতা বলল, কি করব, বেরিয়ে পড়েছি বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। বিজনদা তখন হিরণকে বললেন, আমার ওখানে একটা কাচা বেডসীট আছে ওকে দাও। তা মমতা পাশের ঘরে গিয়ে সেই বেড সীটটি জড়িয়ে, তাঁর কাপড় ঐ ঘরের ফ্যানের নিচে দিয়ে এসে বসলেন। সেই সময় বিজনদা 'আজ বসন্ত' নাটকে একটি চরিত্র বোঝাচ্ছেন। আমি দেখছি বোঝাতে বোঝোতে এমন পর্যায়ে চলে গেছেন যে, তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

বিজনদা একদিন আমায়া জিজ্ঞাসা করলেন, পায়রা ওড়ানো দেখেছ কোনোদিন? আমি বললাম আমি তো শ্মশান পাড়ার ছেলে, হালদার পাড়া তো পাশেই, বহু দেখেছি। উনি বললেন, তা হলে তো ভালোই, কি দেখেছ? আমি বললাম, ৯ — ১০টা নাগাদ শরতের আকাশে ২২০০ পায়রা উড়িয়ে দিল। এবং ২ — ২-৩০ টে নাগাদ তারা নেমে এল। উনি বললেন, তাহলে তো লক্ষ্য করনি, যেটা হয় সেটা তো বললে না। আমি বললাম আর তো কিছু বলতে পারব না। উনি বললেন যে, আবার লক্ষ্য করে দেখবে, যদি সুযোগ পাও। যে ঐ-শরতের আকাশে ২০০ পায়রা উড়িয়ে দেয়। তারপর দেখবে ২টি পায়রা ঐ ২০০ পায়রার মধ্য থেকে উড়তে উড়তে ঠিক সবার উপরে চলে গেছে। এই

১৯৮ টি পায়রা আর তাদের ছুঁতে পারছে না। Artistদেরও এই রকম অবস্থা হয় কখনো কখনো। অন্য Artistরা তাকে ধরতে পারে না সে বেরিয়ে চলে যায় নাগালের বাইরে। তখন সে উপর থেকে হাত নামায়। অন্য artistরা চেষ্টা করে হাত ধরবার। তখন নাটকের performance-এ বিজনদাকে দেখেছি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সাহায্যের জন্য দিল্লিতে একটি কনফারেন্স হয়েছিল। সেখানে ক্যালকাটা থিয়েটার মানে আমরা ৩ দিন নাটক করে ছিলাম। প্রথম দিন 'দেবী গর্জন', দ্বিতীয় দিন 'গর্ভবতী জননী', তৃতীয় দিন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর 'লাস ঘুইর‍্যা যাউক'। প্রথম দিন 'দেবী গর্জন' করার পর দিল্লির খবরের কাগজে লেখা হলো, 'দেবী গর্জন' নাকি পোস্টার ড্রামা। সেই শুনে বিজনদা বললেন, দেখেছ তো কেমন পেছনে লেগেছে। এসো পরের নাটকগুলো আরো ভালোভাবে করি। পরের 'গর্ভবতী জননী' এই নাটকে আমার একটি চরিত্র ছিল রাজগুনিন ওঝা। যে চরিত্রটা নাটকের একদম শেষ ১০ মিনিট মঞ্চে থাকবে। তাই আমি ইন্টারভেলের সময় মেক - আপে যেতাম। ইন্টারভেলের আগে পর্যন্ত আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, আগের দিন দিল্লির খবরের কাগজ যেটা বলেনি সেটা বিজনদাকে কতখানি ধাক্কা মেরেছে। সেইদিন দেখেছিলাম বিজনদার অভিনয়, সেই অভিনয় দেখে আমার পায়রা ওড়ানোর কথা মনে পড়ে গেল। যে পায়রা দল ছেড়ে কোথায় চলে যায়। এবং সেই দিন আমাদের সহ অভিনেতারা বিজনদাকে ছোঁবার চেষ্টা করছিলেন। ছুঁতে হয়ত পারেনি কিন্তু অনেকটা উঠতে পেরেছিলেন, সেই দিন একটা পরিণত পারফরমেন্স হয়েছিল। যেটা আমি চাক্ষুস করেছিলাম, তার পরের দিন দিল্লির ঐ খবরের কাগজ কিছুটাconsider করল। তৃতীয় দিন 'লাস ঘুইর‍্যা যাউক' নাটকটি করলাম, সেই দিনটা আরো বেটার। সেটা অবশ্য ছোটো নাটক ছিল। এই স্মরণীয় বহু জায়গা আছে।

৬২ সালে চীনের আক্রমণের পর যখন কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে গেল ১৯৬৪ সালে তখন বিজনদা নিঃসঙ্গ মানুষ। বিজনদার কাছে কেউ আসতেন না। বিজনদার যে শরীর ছিল সেটা by day ভেঙ্গে পড়তে লাগল। তার কিছু আগে মহাশ্বেতা দেবী তাকে পরিত্যাগ করেছেন। ভীষণভাবে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন। আমি অফিসের পর তাঁর বাড়িতে গিয়ে বসতাম। বেশি কথা বলতে পারতাম না। শুধু কথা শুন্তাম। এইরকম কিছু দিন চলার পর তাঁর তখন দুইজন সঙ্গী— একজন হলেন হিরণদি। তিনি পুরোপুরি ঘরের দিকটা দেখতেন। আমরা গেলে চা করে দিতেন। আর একজন তাঁর সঙ্গী ছিল বিপসি, একটি বিদেশী কুকুর। এছাড়া আমি ও বিভূতিদা যেতাম। এইভাবে কিছু দিন চলার পর হঠাৎ একদিন রবিবার সন্ধ্যার সময় আমি গেছি বিজনদার বাড়িতে। বিজনদা বললেন, একটা ভালো খবর আছে। আমি বললাম, বলুন। বললেন, সকালে উৎপল আর শোভা এসেছিল। ওরা 'তিতাস একটি নদীর নাম' নাটকটি মঞ্চস্থ করবে। তাতে রামকেশব বলে একটি চরিত্র আছে। সেই চরিত্রটা করার জন্য আমাকে বললে। আমি বললাম, আপনি কী বললেন? বললেন, কথা দিয়েছি করব। আমি বললাম, রিহার্সাল? বললেন, বুধবার থেকে শুরু হবে। ওরা সকাল ৯টায় গাড়ি পাঠাবে। গাড়ি করেই নিয়ে যাবে এবং দিয়ে যাবে। মিনার্ভাতে রিহার্সাল হবে রাত ৮টা পর্যন্ত। আমি বললাম, আপনি পারবেন? সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা অবধি রিহার্সাল করতে, এই শরীরে, শুগার বেড়ে গেছে। উনি বললেন, ওটা কিছু না, কাজের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। আমিও একদিন বিজনদার সাথে গিয়েছিলামি মিনার্ভাতে রিহার্সাল দেখতে। তারপর তিতাস একটি নদীর নাম রিলিজ হলো মিনার্ভাতে। সেটা দোল পূর্ণিমায় সন্ধ্যা ছিল এবং সেই প্রথম প্রদর্শনীতে সত্যজিৎবাবুও উপস্থিত ছিলেন। সেই নাটকে রামকশেবের চরিত্রে বিজনদা যে অভিনয় করেছিল সে অভিনয় ভোলা যায় না। দিল্লিতে 'তিতাস একটি নদীর নাম' নাটকে বিজনদাকে একদিন তিনটে শো পর্যন্ত করতে হয়েছিল।

মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন অসাধারণ। ওনার যে কিভাবে চলত, আমি প্রত্যক্ষ করেছি। ব্যাঙ্কের পাশ বই রাস্তায় খুলে আমায় দেখিয়েছে, দুশো কত টাকা রয়েছে। এর মাঝখানে একদিন একটি ছবিতে শুটিং করেছিলেন। তাঁর তখন রেট ছিল ৫০০ টাকা per day এবং অনেকেই বিজনদার কথা জানত, জেনে এইভাবে কিছু কিছু গ্যাটিস দিত। একদিনের একটি কাজ, দুই দিনের একটি কাজ। তাই তিনি বলতেন মুখ যিনি দিয়েছেন অন্নও তিনিই যোগাবেন। ওনার এইভাবেই চলত। রোজ রাতে মাংস খেতেন, একপিস্। তার সঙ্গে একটা পেঁপের টুকরোও থাকত। হিরণদিই রান্না করে দিতেন। একটা লাং তাঁর সিল ছিল। তিনি টিবি হাসপাতালেও ছিলেন কিছু দিন। দার্জিলিং -এর ঘোড়ায় চড়তে গিয়ে ঐ লাংটি ড্যামেজ হয়। এ একটা লাং নিয়েই তিনি 'দেবী গর্জন' প্রায় ৮০ - ৯০ রাত শো করেছেন।

বিজনদার কথা শেষ হবার নয়। নানা স্মৃতি ভিড় করে আছে। একটা কথা বলে শেষ করছি বিজনদা অসম্ভব ব্যতিক্রমী নাট্যকার ছিলেন। আমি ধন্য এমন মানুষের সান্নিধ্য পেয়ে।

.

অনুলিখন ঃ অমিত কুমার মাইতি